স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ

প্রথম খণ্ড

পিনাকী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র
ঢাকা-বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার কাজ একাধারে বিপজ্জনক এবং দুরূহ। বাংলাদেশের ইতিহাসের যে বয়ানগুলো হাজির আছে, তার সিংহভাগ উদ্দেশ্যমূলক ও খণ্ডিত। এই খণ্ডিত ইতিহাসে বেশির ভাগ সময় ভীরুরা 'নায়ক' আর বীরেরা 'ভিলেন' বা 'খলনায়ক' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।

আমাদেরকে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান যাঁদের সবচেয়ে বেশি সেই তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজীরা আমাদের খণ্ডিত সেই ইতিহাসে হয় অনুপস্থিত, নয়তো উপেক্ষিত। আমাদের ইতিহাসের তথাকথিত সেক্যুলার বয়ান দাঁড়িয়ে আছে 'অসাম্প্রদায়িকতা' আর 'হাজার বছরের বাঙালি' ধারণার ওপর ভিত্তি করে। সেই বয়ানে জমিদারি উচ্ছেদের লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগকে 'সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী' রাজনৈতিক দল হিসেবে উপস্থাপন করে 'বাতিল' করে দেয়া হয়েছে।

সেই বয়ানে শেখ মুজিবের শাসনকাল ছিল 'স্বর্ণযুগ'। তাহলে আসুন, এবার এই বই-এর হাত ধরে প্রবেশ করি সেই কথিত স্বর্ণযুগে। দেখে নিই, কেমন ছিল সেই দিনগুলো।

মুছে দেয়া আর ভুলিয়ে দেয়া সেই ইতিহাসের জগতে আপনাকে স্বাগত জানাই। গল্পের মতো করে লেখা সেই ইতিহাস আপনাকে কখনো বিস্মিত করবে, কখনো আতঙ্কিত করবে, কখনো-বা কাঁদাবে। আর নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, এত রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে যেই স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার তওফিক হয়েছিল, আমাদের কোন আদি পাপে সেই রাষ্ট্রটা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

অতীতের ভুলগুলো জেনে আগামী প্রজন্ম নতুন এক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে– এটাই হোক সবার আকাঙ্ক্ষা।

পিনাকী ভট্টাচার্য

সূচি

প্রথম অধ্যায়: ১৩-৫৭
১. পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ
২. আত্মসমর্পণের পর
৩. ভারতীয় সেনাবাহিনীর নজিরবিহীন লুটপাট
৪. স্বাধীন দেশে ভারতীয় বাহিনী

দ্বিতীয় অধ্যায়: ৫৯-৯৭
১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রত্যাবর্তন
২. প্রবাসী সরকার ও শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

তৃতীয় অধ্যায়: ৯৯-১২১
১. রণাঙ্গন থেকে ফেরা মুক্তিযোদ্ধারা
২. বীরাঙ্গনা

চতুর্থ অধ্যায়: ১২৩-১৪১
১. জহির রায়হানের অন্তর্ধান
২. ভিত্তিহীন তথ্য, উপাত্তহীন অমীমাংসিত 'সত্য'
৩. মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব পদক

পঞ্চম অধ্যায়: ১৪৩-১৫৯
১. দালাল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ আর বিচার
২. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

ষষ্ঠ অধ্যায়: ১৬১-১৭৯
সংবিধান প্রণয়ন

সপ্তম অধ্যায়: ১৮১-২১৭
শেখ মুজিবের প্রশাসন

অষ্টম অধ্যায়: ২১৯-২২৫
প্রতিরক্ষাবাহিনী

নবম অধ্যায়: ২২৭-২৩৭
বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা

দশম অধ্যায়: ২৩৯-২৫৩
স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ওআইসি সম্মেলন

এগারো অধ্যায়: ২৫৫-২৬৭
১৯৭৩-এর নির্বাচন: রক্তাক্ত বিজয় উদ্‌যাপন

বারো অধ্যায়: ২৬৯-২৮১
রাজনৈতিক নিপীড়ন

তেরো অধ্যায়: ২৮৩-২৯৭
সিরাজ শিকদারের হত্যাকাণ্ড

চোদ্দ অধ্যায়: ২৯৯-৩২৯
১. রক্ষীবাহিনী
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত খুন

পনেরো অধ্যায়: ৩৩১-৩৪৯
ছাত্রলীগের ভাঙন ও জাসদের জন্ম

ষোলো অধ্যায়: ৩৫১-৩৫৭
বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছরের চুক্তি

সতেরো অধ্যায়: ৩৫৯-৩৬৭
ফারাক্কা ব্যারেজ: বাংলাদেশের মরণবাঁধ

আঠারো অধ্যায়: ৩৬৯-৩৮৩
বঙ্গুর পার্বত্য চট্টগ্রাম

উনিশ অধ্যায়: ৩৮৫-৪০১
'৭৪-এর দুর্ভিক্ষ

বিশ অধ্যায়: ৪০৩-৪১৩
তাজউদ্দীনের বিদায়

একুশ অধ্যায়: ৪১৫-৪৪৫
বাকশাল

বাইশ অধ্যায়: ৪৪৭-৪৮৮
শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড

গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১. মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১ (মুক্তিযুদ্ধ)
২. মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম
৩. বালাই ষাট (স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্পর্কিত রচনা)
৪. মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ : সাফল্যের তত্ত্ব-তালাশ (ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্য পেশাগত বই)
৫. ধর্ম ও নাস্তিকতা : বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব
৬. সোনার বাঙলার রূপালী কথা (কিশোরদের জন্য রচিত বাঙলার ইতিহাস)
৭. রবীন্দ্রনাথ : অন্য আলোয় (রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা)
৮. মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনীতি (প্রবন্ধ সংকলন)
৯. নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু স্বল্প জানা বিষয় নিয়ে রচনা)
১০. ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ
১১. মন ভ্রমরের কাজল পাখায় (পশ্চিমা চিত্রকলা সমঝদারির হাতেখড়ি)
১২. এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম : চিন্তার অভিযাত্রা
১৩. ইতিহাসের ধুলোকালি
১৪. ডিসকোর্স অন মেথড; রেনে দেকার্ত (অনুবাদ)
১৫. ওয়েদার মেকার (থ্রিলার সাইন্স ফিকশন)
১৬. চীন কাটুম (ছোটদের জন্য চীন ভ্রমণ কাহিনী)
১৭. রবি বাবুর ডাক্তারি (রবীন্দ্রনাথের ডাক্তারি চর্চা ও স্বাস্থ্য চিন্তা নিয়ে লেখা বই)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ
পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ

'বেদনাদায়ক হলেও বাংলার এই বিভাজন ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য।'[১৫]

ভালো হতো, যদি আমাদের শাসকেরা সময়মতো এটা উপলব্ধি করে ভারতের হাতে এর অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের চলে যেতে দিত।'[১৫]

এক

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর, সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ঢাকার অদূরে ডেমরায় কিছুক্ষণ আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। শীতের কুয়াশাভেজা সকাল। আঁধার তখনো ভালোভাবে কাটেনি। দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৮০০ সৈনিকের সঙ্গে তিন নম্বর সেক্টরের আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হয়েছেন। কাকডাকা এই শিশিরসিক্ত শীতের ভোরে, আধো-আলো-অন্ধকারে ঢাকার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলটির মার্চ করে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এরমধ্যেই খবর এসেছে, পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে।

যদিও তখন পর্যন্ত জেনারেল নিয়াজি নিজে থেকে আত্মসমর্পণের কোনো ঘোষণা দেননি কিংবা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়নি। তবু পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় যে অবধারিত সেটা সকলের মনেই বদ্ধমূল ছিল। সকলের মধ্যেই বিজয়ের আনন্দের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। মুক্ত ঢাকায় প্রবেশের উত্তেজনায় যেন টগবগ করে ফুটছে মুক্তিযোদ্ধারা। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে, অনেকের চোখেই আনন্দাশ্রু। নয় মাসের মরণপণ লড়াই তাহলে শেষ হলো!

হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলেন, ঘন কুয়াশার বুক চিরে একটা সামরিক জিপ আসছে পূর্ব দিক থেকে। সতর্ক হয়ে জিপটিকে লক্ষ্য করতে থাকলেন সবাই। জিপ একটাই, আর সেটা নির্ভয়ে আসছে দেখে সবাই ধরেই নিলেন এটা মিত্রপক্ষীয় সামরিক যান। আরো কাছে আসতেই দেখলেন, তাদের অনুমান নির্ভুল। জিপে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং, বেসামরিক পোশাকে পাকিস্তান আর্মির স্পেশাল কমান্ডো ব্যাটালিয়নের মুক্তিযোদ্ধা মেজর হায়দারকে পাশে বসিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন। এই দু'জন বিজয়ী বীর ইতিহাসের সাক্ষী হতে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কিছুক্ষণ পরে দু'জনেই বিজয়ীর বেশে ঢাকায় প্রবেশ করবেন। শত্রুর সঙ্গে এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেও কে জানতো এর কয়েক বছর পরেই এই দুই বীর নিজ নিজ দেশে সহযোদ্ধাদের হাতে সামরিক অভিযানেই নিহত হবেন। নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছিল, মেজর হায়দার নিহত হবেন ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের সঙ্গে, আর সাবেগ সিং নিহত হবেন ১৯৮৪ সালে স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে শিখ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা জারনাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে। জেনারেল সাবেগ সিং অবসর নেবার পর ভিন্দ্রানওয়ালের সামরিক উপদেষ্টা হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে, বিজয়ী বীরদের উপাখ্যানের সঙ্গে, তাদের এ ট্র্যাজিক মৃত্যুর শর্তও কি লেখা ছিল?

ঢাকা নগরী রক্ষার জন্য পাকিস্তানিদের কোনো সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না। আত্মসমর্পণের আগে পদাতিক, প্রকৌশল, অর্ড্‌ন্যান্স, সিগন্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভিস কোর নিয়ে মোট ফোর্স ছিল বারো কোম্পানি। এ ছাড়া প্রায় ১৫০০ ইপিসিএএফ, ১৮০০ পুলিশ এবং ৩০০ রাজাকার ও আল্-বদর মিলে পাকিস্তানের পক্ষে মোট সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এই সৈন্যদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তারা নিজ নিজ পজিশনে স্থবির-নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল এবং ছোট্ট একটা চাপেই ভেঙে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।[১]

ক্যান্টনমেন্ট বাদে বাকি ঢাকা শহরের রক্ষার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার বশীরের ওপর। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন, মিরপুর সেতু অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফোর্স একত্রিত করে এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সকালের দিকে মেজর সালামতকে তিনি মিরপুর ব্রিজের সুরক্ষার জন্য পাঠান। এদিকে ১৬ ডিসেম্বর সকালেও মিরপুর সেতু অরক্ষিত অবস্থায় আছে– এই খবরটা মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে পৌঁছে যায় ভারতীয় কমান্ডো বাহিনীর কাছে। খবর পেয়ে তারা সকাল হবার কিছু আগেই ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। এদের পৌঁছানোর আগেই মেজর সালামত মিরপুর ব্রিজে অবস্থান নিয়ে নেন। ফলে সেখানে পৌঁছে কমান্ডো বাহিনী প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এই কমান্ডো দলকে অনুসরণ করে পেছনে আসছিলেন ১০১ কমিউনিকেশন জোনের জেনারেল নাগরা। তাদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল সেতু থেকে কিছু দূরে। জেনারেল নাগরার বাহিনীর সাথে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী স্বয়ং এবং 'কাদেরিয়া বাহিনী'র চৌকস মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অগ্রবর্তী দল।

জেনারেল গান্ধর্ব সিং নাগরা আর জেনারেল নিয়াজি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কোর্সমেট ছিলেন, একসঙ্গে কমিশন পেয়েছিলেন এবং দু'জন দু'জনের বন্ধু ছিলেন। নাগরা নিয়াজিকে 'আব্দুল্লাহ' বলে ডাকতেন। আজ ভাগ্যের পরিহাসে দুই বন্ধু যুদ্ধরত দুই শিবিরে। এক বন্ধু পরাজিত, আরেক বন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয়ীর বেশে নগরে ঢুকবেন। নাগরা মিরপুরে আমিনবাজার ব্রিজের ওপার থেকে নিয়াজিকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি ছিল কোনো বন্ধুর কাছে লেখা বন্ধুর চিঠি। লিখেছিলেন: প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি এখানে এসেছি, তোমার খেলা শেষ। আমি পরামর্শ দিচ্ছি– আমার নিরাপত্তায় চলে আসো, আমি তোমার বিষয়টা দেখবো। তোমার প্রতিনিধি পাঠাও।

সকাল ন'টায় চিরকুটটা জেনারেল নিয়াজির হাতে আসে। সেই সময় তার পাশে ছিলেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান ও রিয়ার এডমিরাল শরিফ। মেজর জেনারেল রাও ফরমান নিয়াজিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে? জেনারেল নিয়াজি নিরুত্তর। রিয়ার এডমিরাল শরিফ পাঞ্জাবিতে কথাটা অনুবাদ করে বললেন: 'কুজ পাল্লে হ্যায়?' (থলেতে কিছু কি আছে?)। নিয়াজি বৃহত্তর ঢাকার রক্ষক জেনারেল জামশেদের দিকে তাকালেন। জেনারেল জামশেদ মুখে কিছু না বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন, যার অর্থ হলো– কিছুই নেই, শূন্য। ফরমান আর শরিফ তখন একসঙ্গে বলে ওঠেন: যদি এ-ই হয়, তাহলে যান, যা সে (নাগরা) করতে বলে তা করেন গিয়ে। জেনারেল নিয়াজি জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা

জানানোর জন্য জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন।[২]

দুই

ঢাকা শহরের মতিঝিলে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ (পি অ্যান্ড টি) কলোনি। টেলিগ্রাফের বিহারি প্রকৌশলী ইমতিয়াজ আলম খানের সরকারি ফ্লাটে দূর থেকে ফজরের আজানের শব্দ ভেসে আসছে– আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম। আজানের শব্দ ভেদ করে দরোজায় উত্তেজিত করাঘাত। ইমতিয়াজ আলম খান দরোজা খুলে দিতেই দেখলেন বাঙালি প্রতিবেশী মুহাম্মদ আলী খান মাল্লুর উত্তেজিত চেহারা । মাল্লু সাহেব ধীর-স্থির মানুষ, কিন্তু আজকে তার চেহারা উত্তেজনায় টগবগ করছে।

ইমতিয়াজ তুমি খবর শুনেছ?

কী খবর, মাল্লু ভাই?

'আকাশবাণী' থেকে বলছে, পাকিস্তানি আর্মি আজ সারেন্ডার করবে।

হো হো করে হেসে উঠে ইমতিয়াজ আলম খান বললেন:

মাল্লু ভাই, আপনি 'আকাশবাণী'র কথা বিশ্বাস করেন?

তখন ইমতিয়াজ আলম খান ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, এটাই তার শেষ হাসি হতে যাচ্ছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার জীবন ওলট-পালট হয়ে যাবে।

আরে না, বের হয়ে দেখ, খুব নিচু দিয়ে ইন্ডিয়ান বিমান উড়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানি আর্মির এন্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ গানগুলো কোনো গুলিই ছুঁড়ছে না।

ইমতিয়াজ আলম খানের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা রক্তস্রোত বয়ে গেল। মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললেন:

মাল্লু ভাই, এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্ডিয়ান আর্মি তো ঢাকা পর্যন্ত এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর কার কাছেই-বা নিয়াজি সারেন্ডার করবে?

ইমতিয়াজ আলম খানের এই শীতল জবাব মুহাম্মদ আলী খান মাল্লুকে তৃপ্ত করতে পারলো না, বিড়বিড় করতে করতে বাসায় ফিরে গেলেন তিনি।

এরপর আর বিছানায় যাওয়া হয়নি ইমতিয়াজের। বার বার বারান্দায় গিয়ে দিগন্তে চেয়ে থাকছেন। কী যেন খুঁজছেন। অবশেষে সকাল দশটার দিকে

সেই প্রতীক্ষিত আতঙ্ক– বজ্রনিনাদে উড়ে এলো খুব নিচু দিয়ে– ভারতীয় ফাইটার জেট। এত নিচে যে, পাইলটের চেহারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে কোনো গুলি নেই, কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া নেই, বোমাবর্ষণ নেই। কিন্তু প্লেনের পেটের ভেতর থেকে অসংখ্য টুকরো কাগজ উড়ে এলো, ঢাকার আকাশ ছেয়ে গেল লিফ্‌লেটে। বাংলা, ইংরেজি আর উর্দুতে লেখা পাকিস্তানি বাহিনীকে 'আত্মসমর্পণের আহ্বান'।[৩]

তিন

ঠিক সাড়ে ন'টায় মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসা গাড়ির গর্জন শুনে মিরপুর ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই মাটি কাঁপিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলির শব্দ। চার-পাঁচটি মেশিনগান একসঙ্গে বিকট শব্দে গর্জে উঠে থেমে যায়। চকিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর আবার থমথমে নীরবতা। গুলি ছুড়তেই দ্রুত ধেয়ে আসা গাড়ি দু'টি নিশ্চল হয়ে যায়। মিত্রবাহিনীর ভুল ভাঙে। গাড়ি দু'টি শত্রুর নয়, মিত্রবাহিনীর। গাড়িতে কোনো সাদা পতাকা বা কাপড় না থাকায় শত্রু ধেয়ে আসছে ভেবে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা গুলি ছুড়েছিল।

পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করছে– এই দারুণ সুখবরটি পৌঁছে দিতে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল ওরা। আসার পথে আনন্দের আবেশে কখন গাড়িতে সাদা পতাকার বদলে লটকানো সাদা জামাটি প্রচণ্ড বাতাসে উড়ে গেছে তা তারা জানতেও পারেনি। ভুল যখন ভাঙলো তখন যা হবার হয়ে গেছে। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে শহিদ। আমিনবাজার স্কুলের পাশে দু'টি জিপই নিশ্চল হয়ে আছে। একটিতে তিনজনের মৃতদেহ। রক্তে জিপটা ভেসে গেছে। তখনও রক্ত ঝরছে।

এত যন্ত্রণার মাঝেও আহত একজন জিপের স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। দারুণ সুখবরটা যত তাড়াতাড়ি দিতে পারবে, ততই যেন সহযোদ্ধা হারানোর দুঃখ ও গুলিতে আহত হওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণার উপশম হবে। আহত যোদ্ধার গলার স্বর জড়িয়ে আসা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব প্রত্যয় মেশানো কণ্ঠে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো: শত্রুরা আত্মসমর্পণে রাজি। তাদের দিক থেকে এখনই কোনো জেনারেল আসছে।

যে মিত্রসেনা এই সংবাদ দিলো, তার হাঁটুর নিচের অংশ বুলেটে এফোঁড়-

ওফোঁড় হয়ে গেছে। তিনি তার ক্ষতস্থান দু'হাতে চেপে ধরে সর্বশেষ সংবাদ দিলেন। দুই হাজার বছর আগের ইতিহাস যেন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও ভিন্ন পটভূমিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। ম্যারাথন থেকে এথেন্স নয়, ঢাকা থেকে মিরপুরে গুলিবিদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহের দ্রুত নিঃশেষিত শক্তি শেষবারের মতো একত্র করে শত্রুর আত্মসমর্পণ তথা, পূর্ণ বিজয়ের দারুণ সংবাদ দিলেন এ যুগের বীর সেনানী, এই শতাব্দীর ফিডি পাইডিস।

আহত ও নিহতদের সরিয়ে নেয়ার জন্য হেলিকপ্টার আনা হলো। হেলিকপ্টার আমিনবাজার স্কুলের পাশে পাকা বাড়ির সামনে মসজিদের মাঠে নামিয়ে আহত ও নিহতদের উঠিয়ে দেয়া হলো। হেলিকপ্টার মির্জাপুর হাসপাতালের উদ্দেশে উড়ে যাবার কয়েক মিনিট পর ঢাকার দিক থেকে মার্সিডিজ বেন্‌জ্ জিপে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল, দু'জন লে. কর্নেল, একজন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন সিপাহী আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক পর্ব সারতে এলো।

হানাদারদের পক্ষ থেকে সিএএফ প্রধান মেজর জেনারেল জামশেদ আত্মসমর্পণের প্রথম পর্ব সারতে আসেন। মিত্রবাহিনী যথারীতি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। মেজর জেনারেল নাগরার বামে ব্রিগেডিয়ার সানসিং, তারপর ক্লের, সবশেষে কাদের সিদ্দিকী। জেনারেল সামরিক অভিবাদন জানিয়ে কোমর থেকে রিভল্‌ভার বের করে প্রসারিত দুই হাতে নাগরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মেজর জেনারেল নাগরা বুলেট রেখে রিভল্‌ভারটি জামশেদকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর আগের মতো দুই প্রসারিত হাতে তার টুপি দিলেন। নাগরা লাইন থেকে বেরিয়ে জামশেদের টুপিটি কাদের সিদ্দিকীর হাতে দিলেন। 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' নাগরার হাতে দিলে সেটা তিনি ব্রিগেডিয়ার সানসিং-কে দিলেন। জেনারেল জামশেদ সবশেষে তার কোমর থেকে বেল্ট খুলে দিলে নাগরা তা ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে দেন। তিনি সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য জামশেদকে আবার তা ফিরিয়ে দেন। মেজর জেনারেল নাগরার গাড়ি থেকে যৌথবাহিনীর জেনারেল ফ্ল্যাগ খুলে তা পাকিস্তানি বাহিনীর মার্সিডিজ বেন্‌জে লাগিয়ে জামশেদকে নিয়ে সকলে অবরুদ্ধ ঘাঁটির দিকে এগোলেন।

যৌথবাহিনীর 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' উড়িয়ে মার্সিডিজ বেন্‌জ্ সকাল ১০টা ৫ মিনিটে নিয়াজির ১৪তম ডিভিশন সদর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়ায়।[৪] কর্নেল মেহতা এবং একজন পাকিস্তানি অফিসারকে পাঠানো হয় টঙ্গীতে। তাদের হাতে ছিল সাদা পতাকা। কিন্তু একটা ট্যাংকের গোলা এসে আঘাত করে তাদের জিপে। জিপের আরোহী চারজনই নিহত হন। টঙ্গীতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল

বিকেল চারটার দিকে।[৫] জেনারেল নাগরা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে। তিনি ঢুকলেন গৌরবের শিরোপা ধারণ করে। জেনারেল নিয়াজির অধিকৃত ঢাকার পতন ঘটলো ঠিক তখনই।[৬]

চার

সকাল নয়টা, 'সাকুরা' রেস্টুরেন্টের সামনে ও পাশের গলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটা দল জড়ো হয়েছে। বর্তমান কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ধরে দলে দলে পাকিস্তানি আর্মি হেঁটে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাচ্ছে। তাদের বাম হাতের বাজুতে সাদা কাপড় বাঁধা। আত্মসমর্পণের আগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীর অবশিষ্ট অংশকে একত্রিত করার জন্যই তাদের ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হচ্ছে। কে বলবে এই বিষণ্ন, ভীত এবং নতমুখ সেনারাই গত সাড়ে নয় মাস ধরে অবর্ণনীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল সোনার বাঙলায়। এদের সবার হাতেই রক্তের দাগ।

১১টার দিকে শাহবাগের দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ধরে ধীর গতিতে আর্মির একটি কনভয় এগিয়ে এলো। কনভয়ের প্রথম জিপটিকে আমরা কাকডাকা ভোরে ডেমরা থেকে ঢাকার দিকে আসতে দেখেছি। সেই জিপে আছেন ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং আর মেজর হায়দার। কনভয়টি ডানে মোড় নিয়ে বিজয়ীর বেশে নিউট্রাল জোন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেজর হায়দার আর সাবেগ সিং অগ্রবর্তী দল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেছেন। তাদের মূল দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করা। ধীরে ধীরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এলাকায় মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো। মুক্তিযোদ্ধারা এর মধ্যেই শাহবাগে 'রেডিও পাকিস্তান' ভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। অবরুদ্ধ ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। রাজপথে উৎফুল্ল জনতা মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটা বড় দল 'সাকুরা'র সামনে দিয়ে হেঁটে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় উৎসাহী জনতা তাদের ঘিরে ধরলো প্রবল উত্তেজনায়। সবাই চিৎকার করে তাদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলো: বল শালারা, 'জয় বাংলা'!

চিত্র–কথন:

শেরাটনের সামনে 'সাকুরা'র পাশে জনতা ঘিরে ধরেছে রাও ফরমান আলীকে, শ্লোগান তুলছে– রাও ফরমানকে ধরো, কুত্তার মতো মারো।

ফটো ক্রেডিট: ড. গোলাম নবী কাজীর সংগ্রহ থেকে

ওরা ভয়ে ভয়ে বলে: 'জুই বাংলা', 'জুই বাংলা'। জনতা চেপে ধরে: শালারা শুদ্ধভাবে বল, 'জয় বাংলা', ওরা তাও বলে: 'জুই বাংলা', 'জুই বাংলা'। কেউ কেউ ওদের সঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় 'জয় বাংলা' বলানোর জন্য হাতাহাতি শুরু করে দিলো। এমন সময় কে যেন ফাঁকা বার্স্ট ফায়ার করলো, সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠলো পাকিস্তানিদের হাতে থাকা অস্ত্র। উৎসাহী জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মিত্রবাহিনী ছুটে এসে পাকিস্তানিদের ঘেরাও করে ফেললো। অবস্থা বেগতিক দেখে পাক সেনারা অস্ত্র মাটিতে ফেলে চিৎকার করে বলতে থাকলো: 'জুই বাংলা' 'জুই বাংলা'। গোলাগুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। একজন ভারতীয় সেনা অফিসার ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালেই ছিলেন। তিনি ভারতীয় কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মৃত অফিসারের লাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাও ফরমান আলীকে দেখে জনতা আবার ফুঁসে উঠলো। শ্লোগান উঠলো: রাও ফরমানকে ধরো, কুত্তার মতো মারো। রাও ফরমানকে ঘিরে ধরলো উত্তেজিত জনতা আর মুক্তিবাহিনী। মেজর হায়দার উত্তেজিত জনতা আর মুক্তিযোদ্ধাদের আটকালেন। সাবেগ সিং ইংরেজিতে বললেন, 'নো মোর ফাইট'। রাও ফরমান আলীও বললেন: নো মোর ফাইট, পিস্ পিস্ পিস্। বাংলাতেও বললেন 'আর যুদ্ধ নয়, শান্তি শান্তি শান্তি'।

সেই সময় জান বাঁচানোর জন্য বাংলা বলার চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প পাক সেনাদের গণহত্যার অন্যতম কুশীলব জেনারেল রাও ফরমান আলীর মাথায় আসেনি নিশ্চয়।[৭]

পাঁচ

১৬ ডিসেম্বর সকাল সোয়া ন'টায় মিত্রবাহিনীর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মানেক শ'র কাছ থেকে একটা ফোন কল পান। ফোনে মানেক শ' সন্ধ্যার মধ্যে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ করানোর সকল ব্যবস্থা করতে তাকে নির্দেশ দেন। জ্যাকব বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী থেকে জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও উপ-অধিনায়ক উইং কমান্ডার এ কে খোন্দকার যেন উপস্থিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করতে নিজের দপ্তরকে ব্রিফ করে একটা হেলিকপ্টার নিয়ে যশোর হয়ে ঢাকার তেজগাঁ বিমানবন্দরে নামেন। জ্যাকবের সঙ্গে আসেন আরেক শিখ অফিসার কর্নেল খারা।

পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী জ্যাকবকে বিমানবন্দর থেকে জেনারেল নিয়াজির ঢাকা ক্যানটনমেন্টের দপ্তরে নিয়ে আসেন। সেখানে কিছুক্ষণ আগে মেজর জেনারেল নাগরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখনও টঙ্গীসহ নানা অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানি বাহিনী রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালাচ্ছিল। জ্যাকব সেই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য নিয়াজিকে বলেন, তিনি যেন এই লড়াই বন্ধের নির্দেশ দিয়ে একটা অর্ডার ইস্যু করেন। তখনও নানা জায়গা থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছিল ক্যান্টনমেন্টে। জেনারেল জ্যাকব ভারতের প্যারাসুট রেজিমেন্ট ও একটা পাকিস্তানি ইউনিট দিয়ে জেনারেল অরোরাকে রেসকোর্স ময়দানে গার্ড অব অনার প্রদানের ব্যবস্থা করতে বলেন জেনারেল নাগরাকে।

কর্নেল খারা আত্মসমর্পণের শর্ত জেনারেল নিয়াজিকে পাঠ করে শোনান। নিয়াজির দুই চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকে। ঘরে নেমে আসে সুনসান নীরবতা। যে দম্ভ নিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার আর গণহত্যার নির্মম ইতিহাস তৈরি করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী, জেনারেল নিয়াজির চোখের পানিতেই তা ভেসে যাবার কোনো কারণ ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য আরো চূড়ান্ত অপমান অপেক্ষা করছিল।

লাঞ্চের সময় হয়ে যায়। জ্যাকবকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল নিয়াজি আর্মি মেসে লাঞ্চ সারতে যান। তাদের সঙ্গী হন ব্রিটিশ 'অবজারভার'-এর সাংবাদিক গ্যাভিন ইয়াং। মুরগির রোস্ট দিয়ে মেইন কোর্সের স্বাভাবিক খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। পাকিস্তানি অফিসাররা স্বাভাবিকভাবে খোশগল্প করতে করতে দুপুরের ভোজ সারছেন। জেনারেল জ্যাকব আর কর্নেল খারা এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছেন। দ্যা ভিঞ্চি এই ছবিটা আঁকলে হয়তো নাম দিতেন, 'দ্য লাস্ট লাঞ্চ'। ভিঞ্চি না থাকলেও খ্যাতিমান সাংবাদিক গ্যাভিন ইয়াং ছিলেন। তিনি পরদিন ব্রিটিশ 'অবজারভার'-এ এই লাঞ্চ নিয়ে বিশাল নিউজ করলেন, তার শিরোনাম ছিল 'দ্য সারেন্ডার লাঞ্চ'।

ছয়

লাঞ্চ সেরে জেনারেল নিয়াজিকে নিয়ে জেনারেল জ্যাকব বেলা তিনটার দিকে তেজগাঁ এয়ারপোর্টে যান জেনারেল অরোরাকে রিসিভ করার জন্য। এরমধ্যেই

চিত্র–কথন:

আত্মসমর্পণের আগে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল নিয়াজির শেষ লাঞ্চ। পেছনে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জ্যাকবকে।

ফটো: সংগৃহীত

চিত্র–কথন:

আত্মসমর্পণের আগে ঢাকা সেনানিবাসে ভারতীয় সেনার সাথে হাস্যোজ্জ্বল জেনারেল নিয়াজি। কোমড়ের এই রিভল্‌ভার সমর্পণ করেই আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সারা হবে। পেছনে দেখা যাচ্ছে জেনারেল রাও ফরমান আলী ও বৃটিশ সাংবাদিক গ্যাভিন ইয়াংকে।

ফটো: সংগৃহীত

নানা দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। চারদিক থেকে হালকা অস্ত্রের বিচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। নিয়াজিকে বহনকারী গাড়িকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা আটকে দেয়। কেউ কেউ গাড়ির বনেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিখ অফিসার তার পাগড়িবাঁধা মাথা গাড়ি থেকে বের করে বলেন, নিয়াজি ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি, তাদের এভাবে বাধা দেয়া মুক্তিবাহিনীর উচিত হচ্ছে না। মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীকে চিনতে পেরে নিয়াজিকে ছেড়ে দেয়। এয়ার ফিল্ডে নিয়াজিকে নিয়ে পৌঁছলেও বিপদ কাটে না। অসংখ্য মুক্তিবাহিনীর সদস্য ঢাকায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু তখনো পর্যাপ্ত ভারতীয় সেনা ঢাকায় এসে পৌঁছয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিয়াজিকে অক্ষত কীভাবে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন সেটাই বড় দুশ্চিন্তা। এরই

চিত্র–কথন:

মিত্রবাহিনী ঢাকায় ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তানি সেনারা জানে না যুদ্ধে তারা পরাজিত। তখনো তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। শেরাটনের সামনে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল তখন শক্ত অবস্থানে। পাকিস্তানি অবস্থানের কাছে এসেই মিত্রবাহিনীর কর্নেল কে এস পান্নু দুই হাত মাথার উপরে তুলে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানের দিকে অসমসাহসে এগিয়ে গেলেন। শান্তভাবে বললেন আর গোলাগুলি নয়, যুদ্ধ শেষ। বিহ্বল পাকিস্তানি সেনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে।

ফটো: সংগৃহীত

মধ্যে এয়ারপোর্টে এক ট্রাক বোঝাই মুক্তিযোদ্ধা এসে দাঁড়ায়। জ্যাকব প্রমাদ গোণেন। ঝটপট সেই ট্রাক থেকে তিনজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নেমে আসেন। সামনে দু'জনের পেছনে শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারার এক যুবক জ্যাকব আর নিয়াজির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে আসতে থাকেন। যুবকের কাঁধে মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্কব্যাজ লাগানো আছে। কাছে আসতেই জ্যাকব তাকে চিনলেন– তিনি কাদের সিদ্দিকী, যিনি তার বীরত্বের জন্য ইতোমধ্যেই 'বাঘা কাদের' নামে খ্যাত হয়েছেন। দেশের মধ্যে থেকে শত্রুবাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এক বিপুল শক্তিধর বাহিনী গড়ে যুদ্ধ করে গেছেন এই যুবক। জ্যাকব নিয়াজিকে পেছনে

রেখে কাদের সিদ্দিকীর দিকে এগিয়ে যান। তিনি কাদের সিদ্দিকীকে বলেন, আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজিকে বেঁচে থাকতে হবে।[৮]

জেনারেল নিয়াজি নির্লজ্জের মতো কাদের সিদ্দিকীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন বাঘা কাদের। ভারতীয় কমান্ডার নাগরা কাদের সিদ্দিকীকে দু'বার বলেন, 'টাইগার, পরাজিতের সঙ্গে হাত মেলাও।' কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'নারীর সম্ভ্রমহরণকারী, খুনির সঙ্গে হাত মেলালে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন না।' পেছন ঘুরে কাদের সিদ্দিকী দৃঢ় পদক্ষেপে ট্রাকের দিকে ফিরে যান।[৯]

মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে কে থাকবেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে সেটা তখনো স্থির হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী আছেন রণাঙ্গন পরিদর্শনে। যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রবকে নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সিলেটে মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে গেছেন। ১৩ ডিসেম্বর ওসমানী এই সফরের পরিকল্পনা করেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে এবং চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তাতে এখন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না– এই মর্মে মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এ কে খন্দকার পরামর্শ দিলেও ওসমানী সেটায় কর্ণপাত করেননি।[১০]

সাত

১৩ ডিসেম্বর বিকালে মুক্ত হয়েছে কুমিল্লা। একটা এম-৮ হেলিকপ্টারে ব্রিগেডিয়ার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা পৌঁছেন শেখ কামাল, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, জেনারেল ওসমানী আর মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এমএ রব। বিশ্রামের জন্য কুমিল্লা সার্কিট হাউজে পৌঁছে সবাই হতভম্ব। ওসমানী সাহেবকে হাত বাড়িয়ে 'রিসিভ' করছেন কয়েকজন ভারতীয় বাঙালি। একে একে তারা পরিচয় দিলেন– 'আমি মুখার্জি আইএএস; আমি গাঙ্গুলি আইপিএস ইত্যাদি।' ওনারা বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তারা গতকাল এখানে পৌঁছেছেন কুমিল্লা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তারা শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার সমন্বয় করবেন।[১১]

১৬ ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত জানালেন, আজ ঢাকায় পাকিস্তান সেনারা আত্মসমর্পণ করবে। আশ্চর্য! ওসমানী সাহেব একবারে চুপ, কোনো কথা

বলছেন না।

জেনারেল ওসমানীর এডিসি, শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে বললো:

> স্যার কখন রওনা হবেন তা তো বলছেন না। জাফর ভাই, আপনি যান– জিজ্ঞেস করে সময় জেনে নিন। অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।

ডা. জাফরুল্লাহ জিজ্ঞেস করায় ওসমানী সাহেব ইংরেজিতে বললেন:

> ঢাকার পথে রওনা হওয়ার জন্য কলকাতা থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের কোনো নির্দেশ পাইনি।
>
> আপনাকে অর্ডার দেবে কে? আপনি তো মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। জাফরুল্লাহ বললেন।
>
> যুদ্ধক্ষেত্রে আমি সর্বেসর্বা; কিন্তু মূল আদেশ আসে মন্ত্রিসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বরাতে।

বিষণ্ন মুখে বললেন জেনারেল ওসমানী।

তিনি আসন্ন ঢাকা পতনের সংবাদ জানেন এবং প্রবাসী সরকারের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সঙ্গীদের অস্থিরতা দ্রুত বাড়ছে আর বাড়ছে। শেখ কামাল বারবার ডা. জাফরুল্লাহকে চাপ দিচ্ছেন আবার ভালো করে বুঝিয়ে বলে ওসমানী সাহেবকে রাজি করাতে, ঢাকা রওনা হওয়ার জন্য।

ঘণ্টাখানেক পর জেনারেল ওসমানী অত্যন্ত বেদনাতাড়িত কণ্ঠে বললেন:

> আমার ঢাকার পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ নেই। আমাকে বলা হয়েছে পরে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে একযোগে ঢাকা যেতে, দিনক্ষণ তাজউদ্দীন সাহেব জানাবেন। গণতন্ত্রের আচরণে যুদ্ধের সেনাপতি প্রধানমন্ত্রীর অধীন, এটাই সঠিক বিধান।

তিনি ব্রিগেডিয়ার গুপ্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন:

> সিলেটের কী অবস্থা?
>
> সিলেট ইজ ক্লিয়ার। ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত জানালেন।
>
> তাহলে চলুন আমরা সিলেট যাই। সেখানে গিয়ে আমার বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করবো, শাহ্জালালের পুণ্য মাজারে আমার পূর্বপুরুষরা আছেন।

জেনারেল ওসমানী শেখ কামালকে ডেকে সবাইকে তৈরি হতে বললেন। আধা

ঘণ্টার মধ্যে হেলিকপ্টার উড়লো আকাশে, নিরুপদ্রব যাত্রা সিলেটের পথে। পরিষ্কার আকাশ। হেলিকপ্টারের যাত্রী জেনারেল ওসমানী ও তার এডিসি শেখ কামাল, মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এমএ রব এমএনএ, রিপোর্টার আল্লামা, ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত, ভারতীয় দুই পাইলট এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। কেউ কথা বলছে না, সবাই নীরব।

অতর্কিতে একটি প্লেন এসে হেলিকপ্টারের চারিদিকে চক্কর দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ, ভেতরে জেনারেল রবের আর্তনাদ, পাইলট চিৎকার করে বললেন:

> উই হ্যাভ বিন অ্যাটাক্ড।

রবের উরুতে গোলার আঘাতের পর পরই তার কার্ডিয়াক এরেস্ট হলো। ডা. জাফরুল্লাহ এক্সটার্নাল কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিতে শুরু করলেন। পাইলট চিৎকার করে বললেন:

> 'অয়েল ট্যাংক হিট হয়েছে, তেল বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি বড়জোর ১০ মিনিট উড়তে পারবো' বলে গুনতে শুরু করলেন– ওয়ান, টু, থ্রি... টেন... টুয়েন্টি... থার্টি... ফোরটি... ফিফটি... ফিফটি নাইন, সিক্সটি– ওয়ান মিনিট গান।

এভাবেই পাইলট মিনিট গুনছে, উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত পাইলট। ধীরস্থিরভাবে পাইলটের আসনে বসা অন্য পাইলট। ওসমানী সাহেব লাফ দিয়ে উঠে অয়েল ট্যাংকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন– 'জাফরুল্লাহ, গিভ মি ইয়োর জ্যাকেট।' ডা. জাফরুল্লাহর গায়ের জ্যাকেটটা ছুড়ে দিলে ওসমানী সাহেব ওটা দিয়ে ওয়েল ট্যাংকের ফুটা বন্ধের চেষ্টা করতে থাকলেন। ইংরেজিতে বললেন:

> ভয় পেয়ো না বাছারা, আমি সিলেটকে আমার হাতের তালুর মতো চিনি।

যে বিমানটি থেকে নিখুঁতভাবে হেলিকপ্টারের অয়েল ট্যাংকারে গুলি ছোড়া হয়েছিল তা পাকিস্তানের ছিল না এটা নিশ্চিত। পাকিস্তানের সব বিমান কয়েক দিন আগে ধ্বংস হয়েছে কিংবা গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। তাই আক্রমণকারী বিমানটি ভারতীয় হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গোলা ছুড়ে সেটা হয়তো গুয়াহাটির পথে চলে গেছে।

জেনারেল ওসমানী চিৎকার করে নিচে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন:

এখানে নামো। শত্রুর গুলির স্বাদ নেয়ার জন্য আমাকে প্রথম নামতে দাও, যদি কোনো শত্রু এখনো থেকে থাকে।

এই বলে তিনি তরুণের মতো হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নামলেন।

হঠাৎ গ্রামবাসী এসে ওসমানী সাহেবকে ঘিরে ধরলো– 'দুষমন আইছে-রে-বা দুষমন আইছে, দুষমনরে ধর।' পরক্ষণেই ভালো করে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো:

আমাদের, কর্নেল সাব-রে-বা।

গ্রামবাসী জেনারেল ওসমানীকে ঘিরে নাচতে শুরু করলো।

জনতার বিজয়-উল্লাসে যেন জেনারেল রবের ঘুম ভাঙলো, তিনি চোখ খুলে তাকালেন, সবার মুখে হাসি।[১৯]

আট

সিদ্ধান্ত হয়েছে, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এ কে খন্দকার আত্মসমর্পনের সময়ে ঢাকায় উপস্থিত থাকবেন। তিনি তখন অফিসে ছিলেন না। তাকে চারিদিকে খোঁজ করতে করতে কলকাতা নিউ মার্কেটের কাছে পাওয়া যায়। সেখান থেকেই তাকে দমদম এয়ারপোর্টে চলে যেতে বলা হয়। তিনি তখন সিভিল ড্রেসে ছিলেন। তাই সামরিক পোশাক পরার সময় পাননি। পরিকল্পনা হয়েছে, দমদম থেকে বিমানে আগরতলা গিয়ে আগরতলা থেকে হেলিকপ্টারে আসা হবে ঢাকায়। ঢাকার বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করার অবস্থা ছিল না, ইতোমধ্যেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়েছে।[২০]

দমদম এয়ারপোর্টে এ কে খন্দকার দেখেন, মিত্রবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরা সস্ত্রীক বিমানে উঠছেন। অরোরা তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় আসছেন– তা ভারতীয় বাহিনীর জেনারেল জ্যাকব জানতে পারেন অরোরার স্ত্রী ভান্তি অরোরার কাছ থেকে। মিসেস ভান্তি অরোরা গর্বভরে জেনারেল জ্যাকবকে জানিয়েছিলেন, তিনি আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে অরোরার পাশেই থাকবেন। রণাঙ্গনে স্ত্রীকে নিয়ে না আসার জন্য জ্যাকবের অনুরোধ অরোরা পাত্তা দেননি। তিনি তার সামরিক জীবনের সবচেয়ে শৌর্য্যমণ্ডিত অধ্যায়ের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। স্ত্রীকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়াটাও তার অংশ। তিনি সেদিন কলকাতা থেকে গাঢ় কালো কালির একটি শেফার্‌স্ কলমও কিনেছিলেন আত্মসমর্পণের

চিত্র-কথন:

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রাইফেল কাঁধে ঝুলানো, কালো চামড়ার জ্যাকেটের কলার উঁচিয়ে এক সুপুরুষ মুক্তিযোদ্ধা– মেজর এটিএম হায়দার। এই কালো জ্যাকেটটা মেজর হায়দারের খুব প্রিয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকার সময় পাকিস্তানের ল্যান্ডিকোটাল মার্কেট থেকে কিনেছিলেন। গত এপ্রিলে কিশোরগঞ্জ ব্রিজ ভাঙার সময় যখন কয়েক ঘণ্টার জন্য কিশোরগঞ্জের বাসায় গিয়েছিলেন, তখন তার ছোটবোন আরেক মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সিতারা অন্য কয়েকটা কাপড়ের সঙ্গে এই জ্যাকেটটাও দিয়ে দিয়েছিলেন। একপাশে জেনারেল অরোরা মাঝে নিয়াজিকে রেখে মেজর হায়দার ভিড় ঠেলে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে ঢুকলেন; এরপর এগিয়ে গেলেন আত্মসমর্পণ টেবিলের দিকে।

ফটো: সংগৃহীত

দলিলে স্বাক্ষরের জন্য।

বিকাল চারটায় পাঁচটি এমআই-ফোর ও চারটি আল্যুয়েট হেলিকপ্টারের বহর ঢাকায় ল্যান্ড করে। এই বহরে বেগুনি রঙের শাড়ি পরিহিতা মিসেস অরোরার সঙ্গে ছিলেন জেনারেল অরোরা, এয়ার মার্শাল ধাওয়ান, ভাইস এডমিরাল কৃষ্ণন, জেনারেল স্বগত সিং আর মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার।[১২]

নয়

জেনারেল জ্যাকব আর জেনারেল নিয়াজি তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন মেজর হায়দার আর সাবেগ সিং। এয়ারপোর্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে মিত্রবাহিনী। তেজগাঁ থেকে সরাসরি জিপের বহর ভারতীয় ও বাংলাদেশি সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে রমনার দিকে রওনা দেয়। রাস্তায় জনতার উপচেপড়া ভিড়, কনভয়ের গতি শ্লথ। জিপের আরোহীরা লক্ষ্য করেন, চারিদিকে হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। সকলের চোখে-মুখে অপার আনন্দ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সাক্ষী এই অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে আজ মুক্তির আনন্দ। পথে পথে তারা ঘিরে ধরছেন মুক্তিযোদ্ধাদের, হাত মেলাচ্ছেন, সহোদরের মতো বুকে জড়িয়ে ধরছেন। মুহুর্মুহু উল্লাসে ফেটে পড়ছেন সবাই। এক অপার্থিব আনন্দ তাদের চোখেমুখে। মেজর হায়দারের জিপটি ভিড় ঠেলে অনেক সামনে এগিয়ে গেল।

বিকাল প্রায় পৌনে পাঁচটা। মিত্রবাহিনী আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডারদের কনভয় রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় পৌঁছায়। রমনায় ততক্ষণে জনতার ভিড়, সেই ভিড় ঠেলে সামনে এগোনো মুশ্‌কিল। নিয়াজির দিকে বর্ষিত হচ্ছিল বিভিন্ন গালি ও তিরস্কার। নিয়াজিকে জনতা ছিনিয়ে নিয়ে যায় কি-না সেই আশঙ্কা সবার। মিত্রবাহিনীকে দিয়ে একটা নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হলো। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রাইফেল কাঁধে ঝুলানো, কালো চামড়ার জ্যাকেটের কলার উঁচিয়ে এক সুপুরুষ মুক্তিযোদ্ধা– মেজর এটিএম হায়দার। এই কালো জ্যাকেটটা মেজর হায়দারের খুব প্রিয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকার সময় পাকিস্তানের ল্যান্ডিকোটাল মার্কেট থেকে কিনেছিলেন। গত এপ্রিলে কিশোরগঞ্জ ব্রিজ ভাঙার সময় যখন কয়েক ঘণ্টার জন্য কিশোরগঞ্জের বাসায় গিয়েছিলেন, তখন তার ছোটবোন আরেক মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সিতারা অন্য কয়েকটা কাপড়ের সঙ্গে এই জ্যাকেটটাও দিয়ে দিয়েছিলেন। একপাশে জেনারেল অরোরা মাঝে নিয়াজিকে রেখে মেজর হায়দার ভিড় ঠেলে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে ঢুকলেন; এরপর এগিয়ে গেলেন আত্মসমর্পণ টেবিলের দিকে।[১৩]

ঢাকা ক্লাব থেকে একটা টেবিল আর দু'টো চেয়ার আনা হয়েছিল। সেখানেই বসলেন দুই কমান্ডার। একজন বিজয়ী, আরেকজন বিজিত– পরাজিত। টেবিলে রাখা হয় আত্মসমর্পণের দলিল। অনেক শখ করে কিনে আনা কলম

এগিয়ে দেন জেনারেল অরোরা। স্বাক্ষর করতে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি দেখলেন কালি আসছে না। দু'-দু'বার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার চেষ্টা করায় অবশেষে কালি এলো। এই চরম অসম্মানের দলিল স্বাক্ষর করার সময়ে নিয়াজির গলা শুকিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কলমের কালিও হয়তো শুকিয়ে গিয়েছিল। আত্মসমর্পণের দলিলে প্রথম স্বাক্ষর করেন জেনারেল নিয়াজি, তারপর স্বাক্ষর করলেন জেনারেল অরোরা। জেনারেল নিয়াজি দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে এপলেট খুলে ফেললেন এবং ল্যানিয়ার্ডসহ রিভল্ভার জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দিলেন। জেনারেল নিয়াজির চোখে তখন অশ্রু। ঘড়ির কাঁটায় চারটা পঞ্চান্ন মিনিট। এরপরে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর বাকি সকল সদস্য অস্ত্র সমর্পণ ও ব্যাজ খোলার আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেন।

ঢাকা শহরের সমস্ত বাড়িতে গাঢ় সবুজের মধ্যে হলুদ রঙে রাঙানো বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা উড়তে শুরু করলো। রমনা রেসকোর্সের এই ময়দানেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চে তার ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন– 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। কী অপূর্ব সংযোগ। সবকিছুই ঠিকঠাক হলো, কিন্তু মিসেস্ ভান্তি অরোরার জন্য আরেকটা অতিরিক্ত চেয়ার ছিল না। ভারতের সামরিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটলো না, পাকিস্তানি জেনারেলের আত্মসমর্পণের সময় বীর ভারতীয় জেনারেল স্বামীর বাহুলগ্না হয়ে থাকার স্বপ্নটা তার অপূর্ণই রয়ে গেল।[১৬]

একজন ফরাসি সাংবাদিক এগিয়ে এসে জেনারেল নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করলেন: এখন আপনার অনুভূতি কী, টাইগার? জবাবে নিয়াজি বললেন: আমি অবসন্ন। পাশে থেকে অরোরা জেনারেল নিয়াজির সমর্থনে এগিয়ে এসে বললেন: এক চরম বৈরী পরিবেশে তাকে এক অসম্ভব দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কোনো জেনারেলই এ পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো করতে পারতেন না।[১৪]

পাকিস্তানের এককালের 'লৌহমানব' ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সেই রাতে, ইতিহাসের সেই সমাপনী পর্বে, তার রোজনামচায় লিখলেন– 'বেদনাদায়ক হলেও বাঙলার এই বিভাজন ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা এই কুহকী বিশ্বাসে মজে ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের শত্রু। ভালো হতো, যদি আমাদের শাসকেরা সময়মতো এটা উপলব্ধি করে ভারতের হাতে এর অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের চলে যেতে দিত।'[১৫]